Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 385–391
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

জগন্নাথ : পূর্ণ ও অপূর্ণ

অভিজিৎ পাল
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : avipal2015@gmail.com

Keyword
জগন্নাথ, জগন্নাথত্ব, পূর্ণ-অপূর্ণ, জগন্নাথ-বিগ্রহ, জগন্নাথ-তত্ত্ব, স্কন্দপুরাণ, পুরীধাম, শ্রীমন্দির, উৎকল।

Abstract
জগন্নাথ হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম জনপ্রিয় পৌরাণিক দেবতা। 'জগন্নাথ' শব্দের আভিধানিক অর্থ জগতের নাথ হলেও বর্তমানে পুরীর জগন্নাথকেই তা চিহ্নিত করে। পুরীর শ্রীমন্দিরকে জগন্নাথের বাসভূমি ভাবা হয়। এখানে তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। শুধুমাত্র জগন্নাথের জন্য পুরীধাম হিন্দু সম্প্রদায়ের চারধামের মধ্যে অন্যতম একধামের মর্যাদা পেয়েছে। পুরীর শ্রীমন্দিরের জগন্নাথের বিগ্রহ প্রথাগত অর্থে অসমাপ্ত। জগন্নাথের দারুময় বিগ্রহকে কেন্দ্র করে সময়ে সময়ে বিভিন্ন তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে কোনো তত্ত্ব প্রাচীন, আবার কোনো তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত নবীন। আপাতদৃষ্টিতে পুরীর জগন্নাথের বিগ্রহ অসমাপ্ত বা অপূর্ণ হলেও সারা ভারতে জগন্নাথকে কখনই অপূর্ণ রূপে দেখার প্রয়াস হয়নি। পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জগন্নাথ বিগ্রহকে অপূর্ণ বলা হলেও জগন্নাথকে পূর্ণ রূপে মানস-প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জগন্নাথ যেমন জগন্নাথ তেমন রূপেই পূর্ণত্বের ভাব বহন করে চলেছে। স্কন্দপুরাণের পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, মহাকবি সরলাদাসের মহাভারত ও ওড়িশার প্রচলিত কিংবদন্তিতে জগন্নাথের উৎস ও অসমাপ্ত বিগ্রহের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কথিত অবন্তীর সূর্য বংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরাকালে জগন্নাথকে বর্তমান রূপেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জগন্নাথের মূর্তিকেন্দ্রিক প্রচলিত প্রায় প্রতিটি মতেই জগন্নাথকে পূর্ণতর সত্তায় স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনে বলা হয়েছে, জগন্নাথের বিগ্রহ অপূর্ণ বা অসমাপ্ত হলেও জগন্নাথের জগন্নাথত্ব পূর্ণ ও অক্ষয়। পূজাস্তোত্রে পুরীর জগন্নাথকে পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়। বলা হয় জগন্নাথ সাক্ষাৎ দারুব্রহ্ম। পার্থিব জীবের কল্যাণে কলিতে জগন্নাথ এমন দ্বিভুজ মূর্তিতে প্রাচীন উৎকলের পুরী নগরে প্রকাশিত হয়েছেন। ব্রহ্মতত্ত্বের দিক থেকে জগন্নাথের বিগ্রহের অপূর্ণতার কথা প্রায় নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রয়াস হয়েছে আদি শঙ্করাচার্যের সময় থেকে। এমনও বলা হয়েছে যে, জগন্নাথ বিগ্রহ বাহ্যত এমন অপূর্ণ দ্বিভুজ বিগ্রহ, কিন্তু স্বরূপত তিনি পূর্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ। তিনি দ্বিভুজ হোন, চতুর্ভুজ হোন, বহুভুজ হোন, এমনকি সাকার হোন বা নিরাকার হোন, তবু তাঁর মূলস্বরূপ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। জগন্নাথের জগন্নাথত্বের কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। জগন্নাথের সঙ্গে পূর্ণতার এই ধারণাটি রয়েছে বলে, বারবার সম্পদলোভী ও পরধর্মবিদ্বেষী অহিন্দু রাজাদের আক্রমণে পুরীর শ্রীমন্দির আক্রান্ত হলে জগন্নাথাদি দেবতার বিগ্রহ শ্রীমন্দির থেকে সরিয়ে গোপনে সংরক্ষণ করা হলেও পুরীর শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসনে জগন্নাথের উপাসনা কখনও থেকে থাকেনি। ব্রহ্মতত্ত্ব সংযুক্ত জগন্নাথত্বের ধারণাটি মূর্তিতে কখনও সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হয়নি। সেই সূত্রে প্রাকৃত

দৃষ্টিতে জগন্নাথ 'অপূর্ণ' হতে পারেন, কিন্তু পরমব্রহ্ম জগন্নাথ সবসময় 'পূর্ণ'ই।

Discussion

ভারতীয় দেবদেবীর মধ্যে জগন্নাথ অন্যতম বৈচিত্র্যময় দেবতা। 'জগন্নাথ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ জগতের নাথ বা রাজা। এই দিক থেকে দেখা হলে 'জগন্নাথ' শব্দটি একটি প্রত্যক্ষ শব্দ। ইংরেজি পরিভাষার অবলম্বনে বলা যায় 'জগন্নাথ' সংস্কৃত ভাষায় একটি জেনেরিক শব্দ। বৈদিককাল থেকে ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনায় ঈশ্বর বা পরমসত্তাই সমগ্র জগতের অধীশ্বর। 'জগন্নাথ' শব্দটি অধুনা মূলত পুরীর জগন্নাথদেব অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুরীর জগন্নাথকে বিষ্ণুরই একরূপ চিন্তা করা হয়। আবার এর সমার্থক শব্দ 'বিশ্বনাথ' ব্যবহৃত হয় মহাদেব শিব অর্থে। অন্যদিকে সারা ভারতেই ভগবতী আদ্যাশক্তি দেবী অর্থে 'জগন্মাতা' ও 'জগদীশ্বরী' শব্দেরও বহুল প্রচলন রয়েছে। ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনায় ঈশ্বর স্বরূপত এক, তাঁর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। একই নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ, সাকার হয়ে লীলাবর্ধন করেন। জগন্নাথকে সেই চূড়ান্ত পরমতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়ে আসছে। জগন্নাথের মধ্যে এসে যে হিন্দুদের প্রধান পঞ্চাঙ্গ ধর্ম শাখা অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর মিলে মিশে এক হয়ে যায়, এটি তার অন্যতম একটি দিক।

আক্ষরিক অর্থেও জগন্নাথ জগতের নাথ, গোটা জগৎটাই তাঁর। কিন্তু তার বিরাট রাজ্যের মধ্যে উৎকলের পুরীধাম জগন্নাথের রাজধানী। রাজার রাজত্বের মধ্যে রাজধানীর একটি বিশেষ গুরুত্ব থাকে। কারণ রাজধানীতে স্বয়ং রাজা বাস করেন। রাজধানী থেকে তাঁর রাজ্য পরিচালনা চলে। এটিই প্রাচীন রাষ্ট্রপরিচালন রীতি। তাই জগন্নাথের প্রধান বিগ্রহ ও মন্দির পুরীধামে অবস্থিত। হিন্দুদের একাধিক পুরাণে জগন্নাথের সূত্রেই পুরীর নগরের নামোল্লেখ রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান চারধামের মধ্যে পুরীধাম অন্যতম। 'স্কন্দপুরাণ'-এর বিষ্ণুখণ্ডের পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে পুরীধাম সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> "অহো তৎ পরমং ক্ষেত্রং বিস্তৃতং দশযোজনৈঃ।
> তীর্থরাজস্য সলিলাদুত্থিতং বালুকাচিতম্।।
> নীলাচলেন মহতা মধ্যস্থেন বিরাজিতম্।
> একস্তননিব পৃথ্ব্যাঃ সুদূরাৎ পরিভাবিতম্।।"[১]

অর্থাৎ, সেই পরম রমণীয় আশ্চর্য ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত ও তীর্থরাজ সমুদ্রের জল থেকে সমুত্থিত হয়ে বালুরাশিতে ঘেরা। এর মধ্যস্থলে বৃহৎ নীলপর্বত দ্বারা পরিশোভিত রয়েছে। অনেক দূর থেকে এই ভূমিকে যেন পৃথিবীর একটি স্তনস্বরূপ মনে হয়। নীলপর্বত ও নীলপর্বতে বসবাসকারী নীলাদ্রীমহোদয় জগন্নাথের রাজধানী পুরীর মহিমা বোঝাতেই এত শত আয়োজন করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। যে পুরীধামে বসে জগন্নাথ তাঁর বিরাট রাজ্য শাসন ও রাজকার্য পরিচালনা করে চলেছেন তার মাহাত্ম্য ও আধ্যাত্মিক গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতেই এই আয়োজন। স্কন্দপুরাণে আরও রয়েছে পুরাকালে নারায়ণের বরাহ অবতার লীলাবিলাসের সময়েও পুরীর অস্তিত্ব ছিল। এছাড়াও ওড়িশায় লোকবিশ্বাস রয়েছে, পুরীর নারায়ণের ভোজনের পীঠস্থান। সারাদিন ধরে রাশি রাশি রান্না করা ভোগরাগ-নৈবেদ্য তীর্থদেবতা জগন্নাথকে এখানে অর্পণ করা হয়। পুরীধামে বারবার আচমন করে, ছাপান্ন ভোগ-নৈবেদ্য গ্রহণ করে ও ভোজনের পর পুনরাচমন করতে করতে তীর্থদেবতার হাতের জল শুকানোর অবকাশ থাকে না। অন্যদিকে সারা ভারতের বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে মনে করা হয় প্রতিদিন বিষ্ণু ভারতের রামেশ্বরম্ধামে স্নান করেন, পুরীধামে ভোজন করেন, দ্বারকাধামে শৃঙ্গার ও রাজদায়িত্ব পালন করেন, অবশেষে বদ্রীধামে তিনি ধ্যান ও বিশ্রাম করেন। চারধামের প্রধান চারজন আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুস্বরূপ হলেও প্রতিটি ধামে দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের পৌরাণিক মাহাত্ম্য রয়েছে। যেমন উত্তর ভারতের বদ্রীধামে তিনি নারায়ণ, দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমে তিনি রামচন্দ্র, পশ্চিম ভারতের দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র, পূর্ব ভারতের পুরীতে জগন্নাথ মহাপ্রভু। এই চারধামে তীর্থদেবতা প্রত্যক্ষলীলায় মেতেছেন যথাক্রমে সত্য (কৃত), ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে। এখন কলিযুগে নীলাচলে জগন্নাথ নিত্য প্রত্যক্ষ লীলাময়। এই সূত্র ধরে চলমান কলিযুগে জগন্নাথের দিব্য লীলা চলছে নীলাচলে। কলিযুগের শেষ পর্যন্ত পুরীতে জগন্নাথের ভক্তসঙ্গে বিভিন্ন লীলাবিলাস চলতে থাকবে। এই চারধামের মধ্যে একমাত্র পুরীধামেই নারায়ণের বিগ্রহ প্রথাগত অর্থে তুলনামূলক অসম্পূর্ণ বা প্রাকৃত বা লৌকিক। সাধারণভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খণ্ডিত, অসমাপ্ত, অপূর্ণ,

বিকৃত, কীটদংশিত বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেববিগ্রহ পূজার শাস্ত্রসম্মত রীতি নেই। কিন্তু পুরীর বর্তমান মন্দিরের স্থানে জগন্নাথের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে শাস্ত্র-প্রচলিত এই নীতির ব্যতিক্রম রয়েছে কমপক্ষে তেরশো শতাব্দী ধরে। পুরীধামের নিয়ম ভাঙার দেবতা জগন্নাথের কাছে আপাতভাবে এই শাস্ত্রীয় অনিয়মও গভীর শাস্ত্রসম্মত নিয়ম হয়ে উঠেছে। আর ঠিক এখান থেকেই জগন্নাথকে ঘিরে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার একটি আপাত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

জগন্নাথ বিগ্রহের বর্তমান রূপ বিষয়ে একটি কাহিনি বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। পুরাকালে উৎকলে বিশ্বাবসু শবর নীলপর্বতের কোনো এক গোপন স্থানে নীলমাধব রূপে বিষ্ণুর প্রথম সাকার বিগ্রহ জগন্নাথের উপাসনা করতেন। এই বিশ্বাবসু ছিলেন উৎকলের শবর সমাজের রাজা। সেই সূত্রে উৎকলের শবর সমাজের আরাধ্য দেবতার পদে জগন্নাথ নীলমাধব রূপে আসন পেতেছিলেন। জগন্নাথও হয়ে উঠেছিলেন শবরের দেবতা। অবন্তীর আর্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব রূপে বিষ্ণুর সাকার রূপের মর্ত্যলোকে অবস্থানের সংবাদ পেয়েছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে আরাধ্য দেবতা নীলমাধবের অনুসন্ধান করতে পূর্বভারতে পাঠিয়েছিলেন। পূর্ব ভারতের অনেক স্থানে বহু অনুসন্ধানের পর উৎকলে এসে বিদ্যাপতি শবররাজ বিশ্বাবসুর সান্নিধ্যে আসেন। বিশ্বাবসুর কাছে থাকতে থাকতে ক্রমশ বিদ্যাপতি বুঝতে পারেন শবররাজ বিশ্বাবসুর আরাধ্য দেবতা আসলে নীলমাধব বিষ্ণু। বিশ্বাবসুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তাঁর বিশ্বাস অর্জনের পর একদিন বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ শবররাজের কাছে নীলমাধবের দর্শন কামনা করেন। কাপড়ে বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে নীলমাধবের সামনে আনেন। বিশ্বাবসুকে ছল করে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি সমস্ত পথে সরষের দানা অল্প অল্প করে ফেলতে ফেলতে যান। শবরসমাজের বাইরের কোনো মানুষ এই প্রথম নীলমাধবের দর্শন লাভ করেন। এই ভাবে নীলমাধবের সন্ধান পেয়ে সেই সংবাদ বিদ্যাপতি উৎকল থেকে অবন্তীতে ফিরে গিয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে পৌঁছে দেন। ততদিনে বিদ্যাপতির ফেলে যাওয়া সরষের দানা থেকে গাছ হয়ে তাতে হলুদ ফুল ধরেছে। এভাবে পথ চিনে বিদ্যাপতি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের সন্ধানে যান। কিন্তু এত আয়োজনের পরেও নীলমাধবের দর্শন করতে এসে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন নীলপর্বতের গুপ্তস্থানে আসেন তখন নীলমাধব সেই স্থানে আর ছিলেন না। দেবতার অদর্শনে ইন্দ্রদ্যুম্ন মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে তিনি আকাশবাণী লাভ করেন, সমুদ্রে ভেসে আসা শঙ্খ-চক্র চিহ্নিত দারুখণ্ড থেকে বিগ্রহ নির্মাণ করে তিনি যেন বিষ্ণুর সাকার রূপের মর্ত্যলোকে পূজা প্রচলন করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রে ভেসে আসা নিমদারু সংগ্রহ করে আরাধ্য দেবতার মূর্তি নির্মাণের আয়োজন শুরু করেন। কিন্তু এখানেও একটি সমস্যা তৈরি হয়। ভেসে আসা এই কাঠে অবন্তীর প্রায় কোনো শিল্পকারই দাগটুকু কাটতে পারেননি। অবশেষে বৃদ্ধ দারুশিল্পীর ছদ্মবেশে আসা বিশ্বকর্মাই এই কাঠ থেকে জগন্নাথের বিগ্রহ তৈরি করবেন বলে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি রাজাকে শর্ত দেন জগন্নাথের বিগ্রহ তৈরির সময় নির্মাণকক্ষের দরজা খুলে তাঁর কাজে কেউ কোনোভাবে সামান্যতম বিঘ্ন করলে তিনি তৎক্ষণাৎ কাজ থামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। বিশ্বকর্মার এই শর্তেও উপস্থিত সবাই রাজি হন। বর্তমান গুণ্ডিচা ভবনেই জগন্নাথের বিগ্রহ তৈরি শুরু হয়। কিন্তু এরপরেও মূর্তি নির্মাণের পনেরো দিন পর নির্মাণঘরের ভেতর থেকে জগন্নাথের মূর্তিনির্মাণের কোনো শব্দ না পেয়ে গুণ্ডিচা রানীর সন্দেহের বশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্মাণকক্ষের দরজা খুলে ফেলেন। শর্ত লঙ্ঘন হতেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা অন্তর্ধান করেন। এর ফলে জগন্নাথ সহ চতুর্ধা দারুবিগ্রহ অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে যায়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অনুতপ্ত হলে সেই সময় দৈববাণী হয় এই অসমাপ্ত বিগ্রহই পূর্ণ এবং এই রূপেই বিষ্ণু পূজাগ্রহণে আগ্রহী। দৈববাণী লাভ করে দারুবিগ্রহের দারুলেপ সংস্কার ও অঙ্গরাগের পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই বিগ্রহই পূর্ণরূপে উপাসনা শুরু করেন। বলা হয় সেই বিগ্রহ একইভাবে আজও পূজিত হয়ে আসছে। এই কাহিনির স্কন্দপুরাণের এই সূত্রটি ছাড়াও ওড়িশার শূদ্রমুনি মহাকবি সরলাদাসের মহাভারতের উত্তরভাগ ও ওড়িশার একাধিক বহুল প্রচলিত কিংবদন্তিতে জগন্নাথের উৎসের কাহিনি রয়েছে। চরিত্রের ঘনঘটা ও কাহিনির সামান্য সামান্য বাঁক পরিবর্তনগুলি বাদ দিলে প্রায় সমস্ত জগন্নাথ-কাহিনিতে জগন্নাথের মূর্তিকে কেন্দ্র করে সার কাহিনি এটিই।

'স্কন্দপুরাণ'-এর বিষ্ণুখণ্ডের মধ্যকার পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য অংশই বর্তমান সময়ে প্রচলিত জগন্নাথতত্ত্বের সবচেয়ে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য সূত্র। জগন্নাথের পরিপূর্ণ রূপবর্ণনা স্কন্দপুরাণে রয়েছে : "তমারাধ্য জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্।"[২] অস্ত্রধারী রূপের আয়োজন থেকে জগন্নাথ মহাপ্রভুর চারটি পূর্ণহাতের অনুসঙ্গ স্কন্দপুরাণেই পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে

উল্লেখিত ব্রহ্মা কর্তৃক জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্র-সুদর্শনের স্তুতিতেও জগন্নাথ ও তাঁর পার্শ্বদেবতাদের পূর্ণ রূপের পরিচয় মেলে। এখানে জগন্নাথদেব চতুর্ভুজের চতুরায়ূধ ও পদ্মাসনে পা ভাঁজ করে বসা দেবমূর্তি। কিন্তু এ তো গেল জগন্নাথের পৌরাণিক রূপের কথা। জগন্নাথ বিগ্রহ বর্তমান সময়ে কেমন দেখতে সেই বিষয়টি এবার দেখা যাক। জগন্নাথ বিগ্রহের তথাকথিত দেবতার মতো বা মানুষের মতো অবয়ব নেই। পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ জগন্নাথের মুখ। জগন্নাথ বিগ্রহের মুখমণ্ডলের প্রধান ভাগ নিয়ে রয়েছে তাঁর বিরাট বিরাট দুটি চোখ। কালো রঙের ওপর আরক্তিম দুটি বড় বড় গোলাকার চোখ। জগন্নাথের চোখই তাঁর প্রধান আইডেনটিটি বলা যেতে পারে। জগন্নাথের বিগ্রহে বিরাট দুটি চোখ থাকলেও তাতে চোখের পাতা ও তার ওপরে ভ্রূ-যুগ্ম নেই। চোখের পাতা না থাকায় অপলক দৃষ্টি জগন্নাথের। কথিত অপলক দৃষ্টিতে ভক্তদের দেখতে দেখতে ও জন্ম থেকে নিদ্রাহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে তাঁর চোখের পাতা নেহাত অব্যবহারে লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রথাগত নাক ও কান জগন্নাথের বিগ্রহে দেখা যায় না। দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থান থেকে সামান্য নিচে নাকের মতো একটু উঁচু অংশ থাকলেও তাতে সামান্যতম নাসাছিদ্র থাকে না। এমনকি রঙ দ্বারা যেভাবে বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহে নাসা আঁকা হয় তাও জগন্নাথ বিগ্রহে অনুপস্থিত থাকে। নাকের মতো সামান্য উঁচু হয়ে থাকা এই অংশের ঠিক নিচে রয়েছে তাঁর ঠোঁট। জগন্নাথ বিগ্রহের ঠোঁটটি আকর্ণ প্রসারিত ও প্রায় বিগ্রহের গলার কাছে পর্যন্ত তা নেমে আসে। আবার প্রথাগতভাবে গলাও জগন্নাথ বিগ্রহে দেখা যায় না। বরং প্রায় সেই অংশ থেকে দু'পাশে তাঁর দুটি অপূর্ণ হাত দেখা যায়। জগন্নাথ বিগ্রহের মুখই প্রধান অংশ। জগন্নাথ বিগ্রহের মুখের ঠিক তলার অংশ থেকে নীচের বাকি অংশ আংশিক গোলাকৃতি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জগন্নাথের চোখ এসে মিশেছে ঠোঁটে, ঠোঁট মিশেছে গলায়, গলা এসে মিশেছে তাঁর বাকি শরীরে এবং জগন্নাথের অসমাপ্ত হাতের আয়োজন থাকলেও তার প্রথাগত পা থাকে না। ওঁ-কার উচ্চারণে যেমন অ-কার উ-কারে মেশে ও অ-কার মিশ্রিত উ-কার ম-কারে এসে মিশে অ-উ-ম মিলে পরিপূর্ণ ওঁ-কার উচ্চারিত হয় তেমন করেই যেন জগন্নাথের এক একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গে মিশে তা পরিপূর্ণ জগন্নাথের প্রকাশ করে। পুরীতে জগন্নাথের প্রাত্যহিক পূজাস্তোত্রেও তাঁকে বলা হয়েছে,

"যং দারুব্রহ্মা মূর্তিং প্রণবতনুধরং সর্ববেদান্ত সারং।"[৩]

দারুব্রহ্ম জগন্নাথ একাধারে প্রণবতনুধর বা ওঁ-কার স্বরূপ। তিনিই আবার সর্ববেদান্তের সার। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গের সার হলেন ব্রহ্ম। জগন্নাথের তথাকথিত অপূর্ণতা অনেকটাই তাঁর বাহ্যরূপ।

সংস্কৃত ভাষায় জগন্নাথকে বলা হয়েছে দারুব্রহ্ম। সংস্কৃতে দারু শব্দের একটি অর্থ কাঠ। জগন্নাথের বিগ্রহের প্রধান উপকরণ সুলক্ষণযুক্ত নিম কাঠ। হিন্দুদের উপাসনার জন্য তৈরি হওয়া দেবমূর্তির গঠনরীতিতে ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা তৈরি মূর্তির বহুল স্বীকৃতি থাকলেও পৃথকভাবে কাঠের বিগ্রহের তথাকথিত স্বীকৃতি ছিল না। অথচ আচার্য আদি শঙ্করের উৎকল-বঙ্গে আগমনের পূর্ববর্তী সময় থেকেই জগন্নাথের বিগ্রহ কাঠ দিয়েই তৈরি করা হতো।[৪] আদিতে জগন্নাথের বিগ্রহ দারুতে তৈরির পর থেকে ধীরে ধীরে ওড়িশা-বঙ্গ সহ বিশেষত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে দারুতে বিভিন্ন দেববিগ্রহ তৈরির রীতি তৈরি হয়েছে। এমনকি বাংলার অনেক মন্দিরের প্রাচীন কালী, রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্য-নিত্যানন্দের বিগ্রহ নিমকাঠে তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীন সময়ে জগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে অন্ত্যজ শবরদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল ও এখনও তা আছে। স্কন্দপুরাণেও শবররাজ বিশ্বাবসুকে জগন্নাথের প্রথম উপাসকের পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সারা ভারতের বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে টোটামে দেব-উপাসনার রীতি এখনও প্রচলিত রয়েছে। জগন্নাথের এই লৌকিক উৎসের মধ্যে অবশ্যই বিশেষ সারবত্তা রয়েছে। নইলে পৌরাণিক সাহিত্যের যুগে একজন শবরকে জগন্নাথ উপাসনার সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে বেঁধে ফেলা খুব সহজ হতো না। জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতির দেবতা—আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে একথা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। জগন্নাথ বিগ্রহকে ঘিরে এই বিচিত্র অভিনিবেশ বহুকাল ধরে তাঁর একাধিক পূজাস্তোত্রেও প্রচলিত রয়েছে। জগন্নাথ নিজে মানুষের সঙ্গে লীলাবিলাসে দারুময় শরীর ধারণ করেছেন, এমনই মধুর একটি মত প্রকাশ করেছেন স্কন্দপুরাণকার ব্যাসদেব :

"পুরুষোত্তমাখ্যং সুমহৎ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্।
যত্রাস্তে দারবতনুঃ শ্রীশো মনুষ্যলীলয়া।।
দর্শনান্মুক্তিদঃ সাক্ষাৎ সর্বতীর্থফলপ্রদঃ।"[৫]

অর্থাৎ, জীবের কল্যাণে লীলাবিলাসের জন্য জগন্নাথের এমন দারুময় তনুতে এমন নবরূপে আবার আবির্ভাব ঘটেছে। শুধুমাত্র নিজের ভক্তদের সঙ্গে জাগতিক লীলাবিলাসের জন্য লীলাপুরুষোত্তমের এমন আপাত অপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করা। পুরীতে তাঁর নিত্য অবস্থানের মধ্যে দিয়ে এই স্থানকে সমস্ত তীর্থের ফলপ্রদ করে তোলা। তাই পুরীর অন্যনাম হয়েছে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র। বস্তুতপক্ষে ওড়িশার গণচিন্তনে জগন্নাথদেব দারুময় শরীরে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম। নিরাকার সর্বব্যাপী সত্তারই ঘনরূপ সাকার বিগ্রহ জগন্নাথ। এই বিষয়টিকে ব্রহ্মতত্ত্বের দিক থেকে দেখা হলে বলা যায়, ব্রহ্ম অখণ্ডমণ্ডলাকার, জগন্নাথও তেমনই। শুধু জগন্নাথ একা নন, হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্ত আরাধ্য দেবতাই এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের গুণময় সাকার প্রকাশ। গুরুবন্দনার স্তোত্রে ঈশ্বরের এই বিরাট অখণ্ডত্ব বিষয়ে অপূর্ব প্রত্যয় রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে :

> "ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
> তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"[৬]

এই শ্লোকের অর্থ করলে দাঁড়ায়, যাঁর দ্বারা অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর জগৎ সংসার ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ যিনি পরম্পরায় শিষ্যকে দর্শন করাচ্ছেন, সেই গুরুকে নমস্কার। এই শ্লোকে ঈশ্বরের স্বরূপটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বরের এই অখণ্ড, সর্বব্যাপ্ত, বিরাট ও ব্যাপক রূপকেই গুরু শিষ্যকে দর্শন করান। অখণ্ডমণ্ডলাকার শব্দটির সূত্রে বলা যায়, পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা জগন্নাথ নন, আবার জগন্নাথেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিহিত রয়েছে। তত্ত্বগত দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে, সর্বব্যাপ্ত জগন্নাথ যদি অপূর্ণ হন, তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে পূর্ণ বলে কিছু হতে পারে না বা পৃথিবীতে পূর্ণতার সংজ্ঞা তৈরি হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড ব্রহ্মের খণ্ড বলে কিছু হয় না। ব্রহ্মের দ্বৈত কিছু হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দৃষ্টিতে জগন্নাথের মূর্তিতত্ত্বের পূর্ণতার অনুসঙ্গ অনুধ্যান করা চলে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গোবিন্দজীর মন্দিরে কৃষ্ণের বিগ্রহের একটি পদ ভগ্ন হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য ভগবৎ-দৃষ্টি ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে ভগ্ন হওয়া বিগ্রহ যত্ন নিয়ে সারিয়ে তুলে আবার পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে জনৈক সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে তিনি একটি অপূর্ব মন্তব্য করেছিলেন, "অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখনো ভাঙা হন?"[৭] এই হল একজন খাঁটি অদ্বৈতবাদী সাধকের দৃষ্টি। যাঁকে অজস্র সাধক নির্দ্বিধায় পূর্ণব্রহ্ম বলেছেন তাঁর অপূর্ণতা ঘটাই অসম্ভব। বাস্তবিকই যাঁকে বা যাঁর সত্তাকে অখণ্ডমণ্ডলাকার রূপে অনুধ্যান করা হয়, আধ্যাত্মিক পরিসরে তাঁর খণ্ড-অপূর্ণ-অসমাপ্ত রূপের চিন্তা সাধনার উপলব্ধিতে কতটুকু নৈতিক বা বৈধ হতে পারে! সর্বভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের নাগরিকদের মনে ও মননে জগন্নাথদেবের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই ঘটেছে। আপাতদৃষ্টিতে জগন্নাথ বিগ্রহের শারীরিক বা অবয়বগত অপূর্ণতা বলে যা কিছু রয়েছে, তা নিতান্তই বাহ্য। জগন্নাথের জগন্নাথত্ব এগুলিকে অতিক্রম করে আরও গহনে নিয়ে যায়। জগন্নাথ যেমন রয়েছেন, যেভাবে রয়েছেন, যে-আকারে রয়েছেন; তেমনভাবেই জগন্নাথ পূর্ণ। ভারতীয় একাধিক দেবদেবীর উপাসনা যন্ত্রে, ঘটে, সুলক্ষণযুক্ত দিব্যশিলাতেও প্রচলিত রয়েছে। ব্রহ্মকে ঘিরে অণ্ড-পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা ভারতীয় সভ্যতায় আদি শঙ্করাচার্যের সময় থেকেই রয়েছে। যে ব্রহ্মকে পূর্ণ বলা হয়েছে, তাঁকেই যদি অপূর্ণ বলা হলে, তাতে অর্থের বৈপরীত্য তৈরি হয় ও অযথা ভ্রান্তির বেড়াজাল গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি বিশ্বম্ভর দাস তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্যে জগন্নাথকে পরিপূর্ণ স্বরূপ নিয়ে পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার কথা খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন। 'জগন্নাথমঙ্গল'-এ রয়েছে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌরহিত্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে তাঁর দেবনিষ্ঠা, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু সশক্তিক আকাশমার্গে তাঁর সামনে উপস্থিত হন। 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্যে ঈশ্বরের এই রূপ জগন্নাথস্বরূপ। যজ্ঞস্থলে এই দেবদর্শনের অনুসরণ করেই অবন্তীর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমন্দিরের জন্য জগন্নাথের বিগ্রহ তৈরি করিয়েছিলেন। এই কাব্যে আরও রয়েছে :

> "ভগবান প্রকাশ হইলা এইমতে।
> চতুর্ভুজ সর্বজনে দেখিলা সাক্ষাতে।।
> এইরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া ভগবান।
> ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাদের করিব বরদান।।
> সেই চতুর্ভুজ মূর্তি সাক্ষাৎ দেখিলে।
> জীবমাত্র মুক্ত হৈয়া বৈকুণ্ঠেতে চলে।।

তে কারণে উপায় করিব ভগবান।
যুগ অনুরূপ দিব দরশন দান।।
সত্য আদি যুগে চতুর্ভুজ দরশন।
কলিযুগে দ্বিভুজ দেখিবে জীবগণ।।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু দারুময়।
যখন যে লীলা করে সেই সত্য হয়।।"[৮]

এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি বিশ্বম্ভর দাস একটি বিরাট জটিল তত্ত্বের সহজ-সরল সমাধান দিয়েছিলেন। কবি বিশ্বম্ভর দাসের মতে, জগন্নাথ যদি আপাতপক্ষে অপূর্ণ হন তবেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ণ। বিশ্বম্ভর দাসের মতে, জগন্নাথ বিগ্রহে অপূর্ণতা যেটুকু রয়েছে সেটিও জগন্নাথের ইচ্ছায় ও যুগের প্রয়োজনে। বাহ্যত জগন্নাথ দ্বিভুজ। এটি যেন তাঁর একটি ছদ্মবেশ। এই রূপের আড়ালে রয়েছে তাঁর আসল পূর্ণরূপ। পৌরাণিক যুগবিন্যাসের আবর্তে প্রবেশ না করেও এখানে এটুকু বলা যায়, সারা ভারতের জগন্নাথপ্রেমীদের জগন্নাথ-মননের মূল সূত্রটি বিশ্বম্ভর দাসের কাব্যের এই অংশে তাত্ত্বিক বিতর্কের স্তর ভেদ করে অনন্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জগন্নাথের দ্বিভুজ বিগ্রহ কলির যুগপ্রভাবে বাহ্যত এই রূপে দৃষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান যুগের এতকিছুর পরও জগন্নাথ স্বরূপত চতুর্ভুজ বিষ্ণুতত্ত্ব। বিশ্বম্ভর দাসের এই যুক্তি অনুযায়ী জগন্নাথ বিগ্রহ বাহ্যত এমন অপূর্ণ দ্বিভুজ বিগ্রহ, কিন্তু স্বরূপত তিনি পূর্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ। তিনি দ্বিভুজ হোন, চতুর্ভুজ হোন, বহুভুজ হোন, এমনকি সাকার হোন বা নিরাকার হোন, তবু তাঁর মূলস্বরূপ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। জগন্নাথের জগন্নাথত্বের কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। বেদান্তের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষৎ থেকে এই তত্ত্বের অন্দরমহলে প্রথম পদক্ষেপে প্রাথমিক প্রবেশটুকু করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ রয়েছে :

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"[৯]

এর অর্থ, পরমব্রহ্ম যিনি, তিনি সবসময় পূর্ণ। তাঁর নামরূপের মধ্যে থাকা ব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ থেকেই পূর্ণর জন্ম হয়। পূর্ণের কার্যব্রহ্মের সম্পূর্ণ পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণ পরমব্রহ্মই অবশেষ থাকেন। পূর্ণ অক্ষয়। সার কথা হলো, যা পূর্ণতত্ত্ব বা ব্রহ্ম তার পৃথকভাবে কিছু বৃদ্ধিও নেই, হ্রাসও নেই। এমনকি তাঁর পূর্ণত্ব এমনই যে পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলেও পূর্ণই বাকি থাকে। কণামাত্র তাতে হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে না। সাধকের দৃষ্টিতে ব্রহ্মময় জগন্নাথ সেই 'পূর্ণ'। তাই পুরীর শ্রীমন্দিরে বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ শৃঙ্গারের সময় মূল জগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে ধাতব হাত ও পা সংযোজন করা হয়। যেমন— বনভোজী বেশ, গজ উদ্ধারণ বেশ, রাজরাজেশ্বর বেশ, সোনা বেশ, প্রলম্বাসুর বধ বেশ, রঘুনাথ বেশ, বলিবামন বেশ, গিরি গোবর্দ্ধন বেশ সহ আরও একাধিক বেশ-শৃঙ্গারে জগন্নাথকে সোনার তৈরি হাত-পা দিয়ে সাজানো হয়। কিন্তু তাঁর প্রাত্যহিক দিনে একাধিক বেশ-শৃঙ্গারের আয়োজন থাকলেও তখন জগন্নাথকে ধাতব হাত-পা দিয়ে সাজানো হয় না। এমনকি সারাদিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শৃঙ্গার বড় শৃঙ্গার বেশেও এমন আয়োজন থাকে না। এছাড়াও বিশেষ শৃঙ্গারের মধ্যে নবাঙ্ক বেশ, পদ্ম বেশ প্রভৃতিতেও জগন্নাথের বিগ্রহে হাত-পা সংযোজন করা হয় না। এতে বোঝা যায়, জগন্নাথের মূল বিগ্রহের কাছে হাত-পা পর্যন্ত অলঙ্কার স্বরূপ। হাত-পা বিশিষ্ট শরীর যেন একটি মায়ার আবর্ত। আচার্য আদি শঙ্করের 'নির্বাণষট্কম্'-এর প্রথম দুটি শ্লোক থেকে অনন্ত-অক্ষয়ের গভীর ভাবনার উপলব্ধি করতে শেখাটা একটু সহজ হয়। আদি শঙ্করাচার্য লিখেছেন :

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্নি তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধার্তুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্-পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।"[১০]

আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'আমি' মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নই। কান ও জিহ্বা নই। নাক ও চোখ নই। আকাশ ও ধরিত্রী নই। অগ্নি নই, বায়ুও নই। আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব। আমিই শিব বা শিবত্ব আমি। আমি প্রাণনামধারী কেউ নই। আমি প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান— এই পঞ্চবায়ু নই। আমি রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্তধাতু নই। আমি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়— এই পঞ্চকোষও নই। আমি বাগিন্দ্রিয় নই। আমি

হাত ও পা নই। এমনকি আমি জননেন্দ্রিয় ও পায়ুও নই। আমি হলাম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব। আমার প্রকৃত স্বরূপ শিব বা শিবত্বই আমি। এই 'আমি' বিরাট আমি। পুরীর জগন্নাথের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়, জগন্নাথের দারুবিগ্রহটি একমাত্র 'জগন্নাথ' নয়। দারুবিগ্রহের ভেতরে থাকা ও জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকা পরম জগন্নাথই জগন্নাথ। তাই হয়তো নির্দিষ্ট সময়ের পর আষাঢ়ের মল মাস পার করে নির্দিষ্ট তিথি এলে জগন্নাথের বিগ্রহ কৈবল্য বৈকুণ্ঠে মহাসমাধির জন্য প্রস্তুত করা হয়। নবকলেবর উৎসবে ব্রহ্মবস্তু নব-সংস্থাপিত হওয়া আর একটি নতুন জগন্নাথ বিগ্রহ শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসনে বিরাজমান থেকে 'জগন্নাথত্ব' বহন করে নিয়ে চলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় রয়েছে, আত্মা অবিনশ্বর। জড়জগতের প্রতিটি মানুষ যেমন একটি জীর্ণকায় কাপড় সম্পূর্ণ ত্যাগ করে আর একটি নতুন কাপড় পরিধান করে শোভিত হন, আত্মাও তেমনভাবে একটি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুনতর শরীর গ্রহণ করে নিজের প্রবহমানতা বজায় রাখে। পার্থিব শরীর নাশ হলেও আত্মা চিরকালই থাকেন অক্ষয় অবিনশ্বর।[১১] পুরীর জগন্নাথের জগন্নাথত্বের পরিসরে জগন্নাথের বিগ্রহের ক্ষেত্রেও এই পার্থিব নশ্বরতা প্রচলিত রয়েছে। তাই জগন্নাথের পার্থিব দারুময় দিব্যবিগ্রহ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের পর মহাসমাধির মাধ্যমে অতি গোপনে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই ধারণাটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে :

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো নং শোষয়তি মারুতঃ।।"[১২]

জগন্নাথের সঙ্গে পূর্ণতার এই ধারণাটি রয়েছে বলে, বারবার সম্পদলোভী ও পরধর্মবিদ্বেষী অহিন্দু রাজাদের আক্রমণে পুরীর শ্রীমন্দির আক্রান্ত হলে জগন্নাথাদি দেবতার বিগ্রহ শ্রীমন্দির থেকে সরিয়ে গোপনে সংরক্ষণ করা হলেও শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসনে জগন্নাথের উপাসনা কখনও থেকে থাকেনি। জগন্নাথত্বের ধারণাটি মূর্তিতে কখনও সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হয়নি। পরিশেষে এটুকুই বলা যায়, ওড়িশার জগন্নাথ সংস্কৃতির ধারণায়, জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ পর্যন্ত প্রথাগত অর্থে 'অপূর্ণ' হতে পারেন, কিন্তু পরমব্রহ্ম জগন্নাথ সবসময় 'পূর্ণ'ই থেকে যান।

তথ্যসূত্র :

১. তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন, 'স্কন্দপুরাণম্' (বিষ্ণুখণ্ড—পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যম্), দ্বিতীয় সংস্করণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪৩-৮৪৪
২. তদেব, পৃ. ৮৫৮
৩. মুখোপাধ্যায়, সুশীল, 'রহস্যে ঘেরা পুরীর শ্রীজগন্নাথ', প্রথম সংস্করণ, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৫৬
৪. গুপ্ত, সুমন, 'শ্রীজগন্নাথদেবের অমৃতকথা', প্রথম সংস্করণ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩
৫. তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন, 'স্কন্দপুরাণম্' (বিষ্ণুখণ্ড— পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যম্), পৃ. ৮৪৩
৬. স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত), 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' (অখণ্ড), ষষ্ঠ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩৪
৭. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (প্রথমখণ্ড— সাধকভাব), দ্বাদশ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৬
৮. দাস, বিশ্বম্ভর, 'জগন্নাথমঙ্গল', প্রথম সংস্করণ, গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৫, পৃ. ১১২
৯. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৫/১/১
১০. স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত), 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' (অখণ্ড), পৃ. ৩৯৮-৩৯৯
১১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/২২
১২. তদেব, ২/২৩